দেশে বিদেশে

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী

দেশে বিদেশে

মাওলানা ইবরাহিম খলিল

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

অর্পণ

শ্রদ্ধেয় আদীব হুজুরের

দস্ত মোবারকে

ভাষাচর্চা ও মানসগঠনে যাঁর লেখা

আমার প্রধান অবলম্বন

অভিমত

শুধু উর্দুসাহিত্যে নয়, বরং পৃথিবীর সব ভাষাসাহিত্যে সফরনামার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। সাহিত্যের এ শাখার গুরুত্ব আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনই আছে; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম পর্যটকগণ নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষের যুগে অনেক সফরনামা লিখেছেন। বরং সত্য কথা হলো, ভ্রমণ-পর্যটনের সম্পর্ক অর্থনৈতিক উন্নতি ও সভ্যতাগত সমৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সভ্যতাগত উৎকর্ষের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়, হরেক রকম পণ্যসম্ভার নিয়ে ব্যবসায়ীগণ জলস্থল অতিক্রম করে আসেন। আর তারা শুধু পণ্যসামগ্রী বিনিময় করেন না, বরং নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও মতবাদও প্রচার করেন। আবার অন্যদের ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-কারিগরিসহ বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও অবগতি লাভ করেন। এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে রাখে বিরাট অবদান।

যখন থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন থেকে তাদের ভ্রমণ-পর্যটনও কমে গেছে। তাই তো যতগুলো বিখ্যাত সফরনামা পাওয়া যায় এর প্রায় সবগুলো লেখা হয়েছে হিজরী অষ্টম শতকের আগে। যতদিন বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল, তাদের শহরগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য হতো সাধারণত স্থলপথে। বিখ্যাত কিছু সফরনামা হলো—*কিতাবুল বুলদান*, *কিতাবুল*

মামালেক ওয়াল মাসালেক, কিতাবুল হিন্দ ওয়াস সীন, জুগরাফিয়ায়ে জাযিরাতুল গারব, কিতাবুল আকালিম, মুরাওয়াজুয যাহাব, আহসানুত তাকাসীম ফি মারেফাতিল আকালিম, কিতাবুল হিন্দ, মু'জামুল বুলদান, নুযহাতুল মুশতাক, তাকবীমুল বুলদান, রিহলাতুস সারখসি, ফরিদাতুল আজায়েব, তাজুল মাশরিক ফি তাজলিয়াতুল মাশরিক, আজায়েবুল আসফার ইত্যাদি। এছাড়াও আরো কিছু সফরনামা রয়েছে।

এসব গ্রন্থের লেখক হাজারো মুসলিম পরিব্রাজক থেকে মাত্র কয়েকজন। কেননা, সব পরিব্রাজক সফরনামা লেখেননি। সবাই ইবনে জুবাইর উন্দুলুসি, মাসউদি, ইবনে হাওকেল মুসেলি কিংবা ইবনে বতুতা হন না। এতে অনুমিত হয়, মুসলমানগণ তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সভ্যতাগত উৎকর্ষের যুগে জলস্থল চষে বেড়িয়েছেন, অথৈ সাগর দাবড়ে বেড়িয়েছেন, মরু-অরণ্য হয়ে গেছে তাদের পদচারণায় মুখরিত। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তারা ছড়িয়ে পড়েছেন।

চৌদ্দ শতাব্দীতে ইউরোপের দুঃসাহসী নাবিকগণ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। তারা এমন রাস্তা আবিষ্কার করেন যা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও ইয়ামেন হয়ে অতিক্রম করে না এবং আরব-ব্যবসায়ীদের অনুগ্রহের বোঝা বইতে হয় না। তাদের আবিষ্কৃত পথে ব্যবসা-বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকে তাদের হাতে। আরব-বণিকগণ তা দিয়ে উপকৃত হতে পারে না। একজন পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পথটি আবিষ্কার করেন। নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সময় তিনি সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেন। সুদীর্ঘ ৯৩ দিন পর্যন্ত তিনি স্থলভূমি দেখার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। সেই ভয়াবহ সমুদ্রাভিযানে একশোর বেশি নাবিক মারা যায়।

তাদের সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে ইউরোপ থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়।

এই বাণিজ্যিক সমুদ্রপথ দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দর কেপ অব গুড হোপ হয়ে অতিক্রম করে। ফলে চীন ও হিন্দুস্তানের পণ্যসামগ্রী ইউরোপে বা পারস্য উপসাগরে অথবা আফ্রিকায় সেই নতুন আবিষ্কৃত পথে পাঠানো হতে থাকে। এ কারণে স্থলপথে ব্যবসায়ীদের চলাচল কমে যায়। কিন্তু নতুন এই সমুদ্রপথটি কোনো মুসলিম দেশ হয়ে অতিক্রম করেনি। তাই মুসলমানগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

আগে ভারত সাগরের বাণিজ্যিক নৌপথে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। পরে তা ইউরোপীয়রা বিশেষত পর্তুগাল দখল করে নেয়। সমুদ্রপথগুলো চলে যায় অন্যদের কবজায়। এভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়। পৃথিবীর লাভজনক ব্যবসা থেকে মুসলিম দেশগুলো হয়ে যায় একদম বঞ্চিত।

পূর্বে স্পেন থেকে চীনের পূর্ব-উপকূল পর্যন্ত স্থলপথ দিয়ে মুসলিম ব্যবসায়ী ও আলেমদের কাফেলা চলাচল করত এবং সমুদ্রে মুসলমান নাবিকদের পতাকা উড়ত। মুসলমানদের শহরগুলো ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্প-কারিগরির প্রাণকেন্দ্র। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের রাস্তা পরিবর্তন মুসলমানদের আর্থিকভাবে পর্যুদস্ত করে দেয় এবং তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। এভাবে সমুদ্রপথ চলে যায় অন্যদের অধিকারে। আবার সমুদ্রপথও হয়ে যায় বিপদসংকুল। মুসলমানদের বাণিজ্য-কাফেলা লুণ্ঠিত হতে থাকে। একবার তো হিন্দুস্তানের মুফতীগণ হজের ফরজিয়ত রহিত হয়ে যাওয়ার ঘোষণা পর্যন্ত দিয়ে দেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, পর্তুগাল থেকে রওনা হয়ে ভাস্কো দা গামার জাহাজ যখন কালিকুট উপকূলে পৌঁছে, সে আরব-

ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের জাহাজ আটকে দেয় এবং সমস্ত মালামাল ছিনিয়ে নেয়। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে জাহাজের সব যাত্রী মারা যায়। ভাস্কো দা গামা কালিকুটের শাসক জামুরানের কাছে দাবী করে, মুসলমানদের এখানকার বন্দর ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রাখা হোক। দাবী মানতে জামুরান কিছুটা ইতস্তত করে। ফলে সে ৩৮ জন হিন্দু মাঝিকে হত্যা করে এবং বন্দরে গোলা নিক্ষেপ করে।

মুসলমানগণ এখনো পৃথিবীতে ভ্রমণ করে, বিমানেও আরোহণ করে, কিন্তু এটা স্বাধীন আনন্দ-ভ্রমণ নয়; বরং চাকরির খোঁজে, রুটিরুজির খোঁজে ভ্রমণ; নিজের ভাগ্য ফেরানোর জন্য, অন্যদের সেবা-দাসত্বের জন্য ভ্রমণ। এখন মুসলমানদের ভ্রমণ-পর্যটন নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, শিল্প-কারিগরি নেই, নেই জ্ঞানার্জনের সীমাহীন আকর্ষণ। মুসলমানদের এখন সমুদ্র-জয়ের প্রতিযোগিতা নেই, নেই দেশের পর দেশ চষে বেড়ানোর প্রেরণা।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানগণ অন্যদের অনুগ্রহের দাস হয়ে না থেকে পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে শিল্প-বাণিজ্য ও কারিগরিতে নতুনভাবে অগ্রসর হতে পারে। আর সে উদ্দেশ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশ এক রেললাইনে সংযুক্ত হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন পরিকল্পনা তারা নেয়নি। কারণ, এখন পর্যন্ত আমাদের মাঝে এ চেতনা জাগ্রত হয়নি যে, পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে আমরা কী খুইয়েছি আর কী পেয়েছি? আমাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য কী করণীয়? কথাটা আমি বিস্তারিত এজন্য বললাম যাতে বোঝা যায়, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে ভ্রমণ-পর্যটনের সম্পর্ক কতটা গভীর।

সফরনামা আগে যেমন লেখা হতো এখনো লেখা হয়; বরং এখন বেশি লেখা হয়। কেননা, সফর এখন অনেক

সহজ ও আরামদায়ক হয়ে গেছে। তবে সফরের সমস্ত উপায়-উপকরণ অন্যদের দান। তাতে আমাদের কোনো অবদান নেই। এমনকি আমাদের হজের সফরও অন্যদের আবিষ্কৃত ও সরবরাহকৃত বাহনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমরা যে অন্যদের অনুগ্রহ ভোগ করছি, সে অনুভূতি পর্যন্ত আমাদের নেই। আবার আমরা সফর করি, সফরনামা লিখি, কিন্তু সেটা হয় বিবরণমূলক। আগে সফরনামা হতো অনুসন্ধানমূলক। অবশ্য এক হিসেবে এটাও বিরাট প্রাপ্তি। এসব সফরনামায় পৃথিবীর অবস্থা অন্তত জানা যায়, মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়।

আলেমদের মাঝে অনেকে সফরনামা লিখেছেন। তন্মধ্যে আল্লামা শিবলি নোমানির سفر نامۂ روم و مصر و شام আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভীর سیر افغانستان মাওলানা আলী মিয়ার ترکی میں دو ہفتے এবং তাঁর অন্যান্য সফরনামা; মাওলানা মুহাম্মাদ রাবে হাসানি নদভীর دو مہینے امریکہ میں এবং سفر بخارا اور سمرقند; মাওলানা মুহাম্মাদ তকী উসমানীর جہان دیدہ ও دنیا میرے آگے বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে আমি হজের সফরনামার আলোচনা করিনি, যার সংখ্যা দুইশোর অধিক।

আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে ড. আবেদ হোসাইনের সফরনামা رہ نورد شوق ড. ইউসুফ হোসাইন খানের আত্মজীবনী ও ভ্রমণসমগ্র یادوں کی دنیا; জগন্নাথ আযাদের کولمبس کے دیس میں বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা ছাড়া হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ মরহুম, মালিক, হামদর্দ দাওয়াখানা পাকিস্তান; ইবনে ইনশা, কমর আলী আব্বাসি, জামিলুদ্দীন আলী এবং মুজতবা হোসাইনের সফরনামাও অত্যন্ত সুখপাঠ্য। আমারও একটি সফরনামা আছে, دنیا کو خوب دیکھا।

সফরনামার পূর্ণ ফিরিস্তি দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, তাহলে তো কয়েক পাতা লেগে যাবে।

মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানীর বক্ষ্যমাণ সফরনামা ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তিনি বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পড়াশোনার অধিকারী একজন দূরদর্শী আলেম। জামিয়া রাহমানিয়া ও দারুল উলূম দেওবন্দের গৌরব; বিহার ও দক্ষিণাত্যের অহংকার। তিনি একাধারে নতুন প্রজন্মের বিশিষ্ট আলেম, বিজ্ঞ মুফতী, লেখক, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। আবার উদ্যমী ও কর্মবীর। অনেক প্রতিষ্ঠানের জিম্মাদার সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ী ও বন্ধুবৎসল। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং ভাষণদানের জন্য পৃথিবীর অনেক দেশে সফর করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বুদ্ধি-বিচক্ষণতা অতি সূক্ষ্ম আবার কলমও শক্তিশালী ও সাবলীল। তাই তাঁর সফরনামা হয়েছে অত্যন্ত সারগর্ভ তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য।

বক্ষ্যমাণ সফরনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এখন তা বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। সফরনামা শুরু হয়েছে হজের বিবরণের মাধ্যমে। এটাই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সময় হলো—যে দিনগুলো সে হারামাইনে কাটায়। সেখানকার প্রতিটি অণু-পরমাণুকে তাঁর মনে হয় চন্দ্র-সূর্য। একজন খাঁটি মুমিনের প্রেরণা থেকে সফরনামাটি লেখা হয়েছে। সত্যিই তা পড়ার মতো।

একবার তো সবুজ গম্বুজ দেখে লেখকের মহব্বতের ঢেউ ছলকে পড়েছে; সঙ্গে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, মার্চের বিভীষিকা ও খুনরক্তের হোলি খেলার কথাও মনে পড়ে গেছে। তখন তিনি কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন নিজের রক্তাক্ত হৃদয়ের উপাখ্যান। ব্যথা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি রওজায়ে আতহারের সামনে পেশ করেন সেই শোকগাঁথা।